সমকাল

তারিখ ...13.OCT. 2015...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

বই পাইরেসি বন্ধ হোক

প্রকাশনা | কামরুল হাসান শায়ক

বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির নির্বাহী পরিচালক

কপিরাইট আইন ভেঙে বেআইনি নকল বই বাণিজ্য সাধারণত চার প্রকারের হয়ে থাকে। এগুলো হলো–১. ছাপাখানা বেআইনি মুদ্রণ; ২. বই ফটোকপি করে পুনর্মুদ্রণ; ৩. ই-বই বা পিডিএফ কপি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি; ৪. বইয়ের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে পুনর্লিখন ও পুনর্মুদ্রণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পাইরেসির কোনো সুফল শিক্ষার্থীরা পেতে পারে কি-না– এই নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। একটি শ্রেণী মনে করে, পাইরেটেড বইয়ের কারণে উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা স্বল্পমূল্যে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে বই কিনতে পারছেন। প্রধানত মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীরাই এই সুবিধা ভোগ করে থাকেন। আর এ কারণেই বিদেশি বইয়ের পাইরেটেড সংস্করণ বাংলাদেশের বাজারে চলতে পারে। এই বেআইনি বিষয়টিতে এ ঠুনকো যুক্তির মারপ্যাঁচে সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট অনেকেই ছিলেন উদাসীন। ফলে দীর্ঘকাল ধরে পাইরেট চক্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় আজ হয়ে উঠেছে ভয়াবহ শক্তিশালী। হয়ে উঠেছে সমগ্র প্রকাশনা শিল্পের জন্য ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। সামান্য সাত-আট হাজার মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীর স্বল্প মূল্যে পাইরেটেড বই দিয়ে চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে পুরো প্রকাশনা শিল্পই আজ পাইরেসির করাল থাবার নিচে পড়েছে।

শুধু কি তাই? পাইরেটেড বইয়ের কারণে রাষ্ট্র কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেখে নেওয়া যাক। নকল বই বিক্রির ফলে লেখক তার প্রাপ্য সম্মানী থেকে বঞ্চিত হন। যার ফলে তিনি পর্যাপ্ত আয়কর দিতে পারেন না। অপরপক্ষে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রকাশকও লক্ষ্যমাত্রার কর দিতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত সরকার বঞ্চিত হয় বার্ষিক কর আদায় থেকে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, পাইরেসির কারণে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পে বর্তমানে বার্ষিক ক্ষতি প্রায় শতকোটি টাকা। অর্থাৎ সরকারের রাজস্বের ক্ষতির পরিমাণও কোটি কোটি টাকা। পাইরেসির এই নেতিবাচক প্রভাবের কারণে দেশের জিডিপিও উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বমহলে সচেতনতা সৃষ্টি করে সরকারকে এই বিষয়ে অবহিত করানোর সময় এসেছে, যাতে প্রশাসনিকভাবে নকল বইয়ের এই বাণিজ্যের মূলোৎপাটন করা যায়।

বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রকাশনা সংস্থার সংখ্যা প্রায় ১২ শতাধিক। এর মাঝে সৃজনশীল বই প্রকাশ করে থাকে প্রায় সাড়ে তিনশ' প্রকাশনা সংস্থা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে থাকে অন্তত ছয় শতাধিক প্রকাশনা সংস্থা। আর সৃজনশীল বইয়ের পাশাপাশি পাইরেটেড বই প্রকাশ করছে প্রায় ৫০টি প্রকাশনা সংস্থা। আর বাকিরা প্রকাশ করছে নামে-বেনামে শুধুই পাইরেটেড বই। খুব সহজে তাদেরকে আলাদা করে আনা সম্ভব ছিল যদি বিক্রেতারা তাদের আশ্রয় এবং পৃষ্ঠপোষকতা না দিতেন। ২০১৫ সালের মহান একুশে বইমেলায় ২০টি প্রকাশনা সংস্থাকে বিদেশি পাইরেটেড বই প্রকাশের কারণে সতর্কীকরণ করেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট টাস্কফোর্স। প্রকাশক এবং মেলা কমিটির দেওয়া তথ্য মতে, অন্তত পক্ষে ৫০টি স্টলে বিদেশি বইয়ের পাইরেটেড সংস্করণ পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য, নকল বই প্রকাশকের সংখ্যা এত কম নয়।

বাংলাদেশে বই পাইরেসি চক্রের কর্মকাণ্ড ও বিতরণ ব্যবস্থা এতই সুচারু যে, অনেক খ্যাতনামা প্রকাশনীও এই ব্যবস্থার সম্মুখে পড়ে বিপন্নবোধ করে থাকে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এত নকল বই যে ছাপা হচ্ছে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে কীভাবে? সরেজমিনে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের ভাষ্য– স্বল্পমূল্যে ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করতে পারার ফলে ক্রেতাদের আস্থা তৈরি হয়েছে এসব বিক্রেতার ওপর। ফলে নকল বইয়ের একটা বাজার গড়ে উঠেছে, যাকে বিক্রেতারা আর হারাতে চাইছেন না। তাদের বক্তব্য, মূল বই যদি স্বল্পমূল্যে দেওয়া যেত তবে নকল বইয়ের বাজার এত বড় হয়ে উঠত না। বাস্তবে তাদের চাহিদামাফিক এত স্বল্পমূল্যে বই দেওয়া স্বনামধন্য প্রকাশকের পক্ষ সম্ভব নয়। কারণ মূল বইয়ের কাগজ ও ছাপার মান একটা পর্যায় পর্যন্ত তাকে ধরে রাখতে হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের সঙ্গে চিত্রশিল্পীর সম্মানী প্রদান করতে হয়। সর্বোপরি, লেখককে তার প্রাপ্য সম্মানী বুঝিয়ে দিতে হয়। অন্যদিকে নিম্নমানের কাগজে ছাপা এসব নকল বইয়ের জন্য প্রকাশককে কোনো কিছুই দিতে হয় না। ফলে নকল বইয়ের দাম কম রাখা যায়। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন বইটির মূল প্রকাশক এবং লেখক।

পৃথিবীর খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থার বইয়ের বাজার পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত। ফলে তাদের বইগুলো কিছু দরিদ্র ও অনুন্নয়নশীল দেশে পাইরেট হয়ে গেলেও মূল প্রকাশক খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, দেশীয় বাজারে যদি দেশীয় বই পাইরেট হতে শুরু করে তো মূল প্রকাশক সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ আমাদের বাজার অত্যন্ত সীমিত। বই বিক্রির নিজস্ব চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পাইরেটেড বই সেই বাজার দখল করে নেয়। এমনও দেখা গেছে, একটি বইয়ের ১০ কপি চাহিদা নিয়ে কোনো লাইব্রেরিয়ান নীলক্ষেতের কোনো পাইরেট প্রকাশকের কাছে এলে সেই প্রকাশক তাৎক্ষণিকভাবে ওই ১০ কপি বই ছেপে সরবরাহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে পাইরেট প্রকাশকের কাছে মূল প্রকাশকের একটি বই সংগ্রহে থাকাই যথেষ্ট। অন্যদিকে মূল বইগুলো থেকে যায় অবিক্রীত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রকাশকদের কাছে বই প্রকাশ করাই হয়ে উঠেছে দুরূহ ব্যাপার।

পৃথিবীর খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থার বইয়ের বাজার পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত। ফলে তাদের বইগুলো কিছু দরিদ্র ও অনুন্নয়নশীল দেশে পাইরেট হয়ে গেলেও মূল প্রকাশক খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, দেশীয় বাজারে যদি দেশীয় বই পাইরেট হতে শুরু করে তো মূল প্রকাশক সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ আমাদের বাজার অত্যন্ত সীমিত

কপিরাইট আইন, ২০০০-এর ৮২ ধারার বিধান মতে কপিরাইট লঙ্ঘনের শাস্তি অনূর্ধ্ব ৪ বছরের; কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব দুই লাখ টাকা কিন্তু অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড। এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান যথেষ্ট নয় এবং আইনের প্রয়োগ যথাযথ হচ্ছে না বিধায় অপরাধের তুলনায় যথেষ্ট সংখ্যক অপরাধী ধরা পড়ছে না। সরকারিভাবে কপিরাইট ভঙ্গের আইন ও শাস্তিবিষয়ক প্রচার সেভাবে নেই বললেই চলে। কপিরাইট আইন ২০০০-এর ৯৩ ধারা বিধান মতে, গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই সাব-ইন্সপেক্টর বা তার ওপরের পদমর্যাদার কর্মকর্তা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পাইরেটেড দ্রব্য কিংবা নকল করার সামগ্রী জব্দ করতে পারবেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ওয়ারী বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মোশতাক আহমদের কর্মতৎপরতার কথা। কর্মক্ষেত্রে অবস্থানকালীন পুরো সময়টাতেই (২১ মার্চ ২০১৪-৫ জুন ২০১৫) তিনি নকল বই প্রকাশনার বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে কাজ করে যান। ২০১৪ সালের শেষ দিকে তিনি প্রায় এক সপ্তাহের একটি ক্যাম্পিং করেছিলেন পাইরেটেড বইয়ের বিরুদ্ধে। তার এই কাজের ফলে ঢাকা জোনের প্রায় ৮০ ভাগ নকল বইয়ের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি প্রকাশক এবং লেখকদের জন্য ছিল আশাব্যঞ্জক। প্রকাশনা সংস্থাগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপের আরও অব্যাহত অগ্রগতির আশা করতেই পারে।

শুধু ছাপা অক্ষরে নকল বই নয়, অনলাইনে বেআইনি ডিজিটাল সংস্করণের বই এখন সবার হাতের নাগালে। চাইলেই প্রয়োজনীয় বই ডাউনলোড করে পাঠক তার পাঠ চাহিদা পূরণ করে নিতে পারছেন। আমারবই.কম, মূর্ছনা.কম, বাংলাবুকপিডিএফ.বগস্পট.কম, বইয়েরহাট.কম, ইবুকসবিডি.কম প্রভৃতি অগণিত ওয়েবসাইট থেকে পাঠক যেসব বাংলা বই ডাউনলোড করে পড়ছেন তার একটি বইও প্রকাশক ও লেখক কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক আঁধার নেমে আসছে আমাদের প্রকাশনা জগতে। বলতে দ্বিধা নেই, সব পক্ষের কিছু মানুষের নেতিবাচক অংশগ্রহণের কারণেই আজ প্রকাশনা শিল্পের এই দুর্দিন। প্রকাশকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রকাশ করছেন পাইরেটেড বই। বিক্রেতাদের মধ্যেই অনেকে বিক্রি করছেন এই বইগুলো। ব্যক্তিগত লাভের দিকে তাকিয়ে অনেক পাঠক কিনছেন এই নকল বই। ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো আছে প্রশাসনিক ঔদাসীন্য। বিশ্বায়নের এই যুগে পিছিয়ে পড়ে থাকার আজ আর কোনো কারণ নেই। এখন সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর। আমরা চাইছি লেখক, বিক্রেতা, পাঠক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অন্ধকার সময় থেকে বেরিয়ে আলোর পথে যাত্রা করতে। এই অগ্রযাত্রায় আমাদের পাশে আপনাকে পাব– এই আশাটুকু আমরা করতেই পারি।